উচ্চশিক্ষা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের অদ্ভুত বাস্তবতা

পারভীন জলী

পারভীন জলী

প্রকাশ: ০৭ জুন ২০২৬ | ০৭:১০ | আপডেট: ০৭ জুন ২০২৬ | ১২:১৫

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই তৈরি হওয়ার কথা ভবিষ্যৎ গবেষক, চিন্তাবিদ ও জ্ঞাননেতাদের। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব প্রতিষ্ঠানে এমন নিয়োগ নীতি চালু হয়েছে, যা সরাসরি মেধার বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে নীতিটি স্বীকৃত, তা হলো গবেষণাকেন্দ্রিক মূল্যায়ন। একজন প্রার্থীর পিএইচডি ডিগ্রি, গবেষণাপত্র, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সক্ষমতা– এসবই নিয়োগে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে এই মৌলিক কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলকে কেন্দ্র করে এক ধরনের 'ফিল্টার' তৈরি করা হয়েছে, যা ভালো শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এই নীতির সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো, এটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মেধা ও অর্জনকে কার্যত অস্বীকার করে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় একজন শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম স্থান অর্জন করেও গবেষণায় দক্ষতা দেখিয়েও শুধু স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে একটি নির্দিষ্ট সিজিপিএ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ৪.০০/৪.২৫) না থাকার কারণে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এটি মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি এক ধরনের অবিচার।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অসাধারণ ফল করেও শিক্ষক নিয়োগে আবেদন করার সুযোগই পায়নি। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর জানতে পারে, অতীতের একটি ফল তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কীসের জন্য? উচ্চশিক্ষায় বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, বিশেষায়িত শিক্ষা, গবেষণা, চিন্তা– এসবের কোনো মূল্য নেই?

রাষ্ট্র যদি তার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এই বার্তা দেয়– ‘তোমার অতীতই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে’; তবে সেটি নিঃসন্দেহে একটি স্থবির সমাজের লক্ষণ। কারণ জ্ঞানচর্চার মূল দর্শনই হলো ‘মানুষ নিজেকে ক্রমাগত উন্নত ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবে।’

এই নীতির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন ভুল বার্তাও ছড়িয়ে পড়তে পারে– স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে ভালো ফল না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উৎকর্ষ একজন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার স্বপ্ন অর্জনের ক্ষেত্রে বাস্তব মূল্য বহন করে না। ফলে যারা স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারেনি, তারা শুরুতেই নিজেদের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ মনে করতে শুরু করে। এটি জাতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ এতে প্রতিভা বিকাশের পরিবর্তে আত্মবিশ্বাসহীনতা ও নিরুৎসাহ সৃষ্টি হয়।

একই সঙ্গে এই নীতি একটি অদৃশ্য বৈষম্যও তৈরি করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার মান এক নয়; সবার জন্য সমান সুযোগও নিশ্চিত নয়। সেই বাস্তবতা উপেক্ষা করে শুধু স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে সিজিপিএকে চূড়ান্ত মানদণ্ড বানানোর মানে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা আরও সংকীর্ণ করে দেওয়া।

কিছু বাস্তব উদাহরণ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে। একজন শিক্ষার্থী (ছদ্মনাম: সৃষ্টি সরকার) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম হয়ে এমফিল সম্পন্ন করেও শুধু এইচএসসিতে নির্ধারিত জিপিএ না থাকায় শিক্ষক নিয়োগের সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারেননি। আরেকজন (ছদ্মনাম: সোহানা রহমান) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার, গবেষণাপত্র প্রকাশ এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও একই কারণে আবেদন করতে পারেননি। আরও বিস্ময়কর, বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা প্রার্থীরাও এই প্রাথমিক শর্তে আটকে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও ডিগ্রি এখানে গৌণ; স্কুলজীবনের একটি ফলই চূড়ান্ত নির্ধারক! এটি শুধু অযৌক্তিক নয়, বিপজ্জনক। কারণ এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধীরে ধীরে প্রকৃত গবেষক ও মেধাবীদের হারাবে। যারা চিন্তা করতে পারেন, নতুন ধারণা দিতে পারেন, তাদের জায়গা দখল করবে কেবল পরীক্ষাভিত্তিক সাফল্যের ওপর দাঁড়ানো একটি সংকীর্ণ মানদণ্ড।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, এই নীতির কোনো শক্তিশালী একাডেমিক ভিত্তি না থাকলেও তা চালু আছে। পৃথিবীর উন্নত কোনো দেশেই শিক্ষক নিয়োগে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলকে এভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমনকি বাংলাদেশেও দীর্ঘদিন এই প্রথা ছিল না। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এটি যুক্ত হয়েছে এবং অদ্ভুতভাবে সেটিই এখন ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে।

এই বাস্তবতায় স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন, এই নীতি অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। শিক্ষক নিয়োগে মূল বিবেচ্য হতে হবে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের ফল, গবেষণার মান ও জ্ঞান সৃষ্টির সক্ষমতা। অতীতের একটি পরীক্ষার ফল দিয়ে একজন গবেষকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা এক ধরনের মেধাবিরোধী সিদ্ধান্ত।

শুধু এই শর্ত বাতিল করলেই হবে না; উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নিতে আরও কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি। প্রথমত, নবীন শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে, যাতে তারা গবেষণা ও পাঠদানে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এমফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত স্কলারশিপ, আবাসন ও গবেষণা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, গবেষণাকেন্দ্রিক বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার জন্য আলাদা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিকীকরণের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ, দেশের গবেষকদের জন্য আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রবেশাধিকার এবং বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক– এসব ছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই বিশ্বমানের হতে পারে না।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা আজ একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোই নির্ধারণ করবে– আমরা একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজের দিকে এগোব, নাকি গবেষণাকে পাশ কাটিয়ে শুধু পরীক্ষাভিত্তিক ফলের মধ্যে আটকে থাকব। গবেষণাকে অস্বীকার করে কোনো জাতি কখনও এগোতে পারে না। তাই এখনই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে স্কুল বা কলেজ পর্যায়ের ফলের শর্ত বাতিল করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানদণ্ডকে প্রধান বিবেচ্য করা, যাতে সত্যিকারের মেধাবী গবেষকরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান।

ড. পারভীন জলী: অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ট্রেজারার,
নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়